সাম্প্রদায়িকতা

বদরুদ্দীন উমর

ধর্ম এবং সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে যোগসম্পর্ক থাকলেও সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিষ্ঠা স্বতন্ত্র জিনিস। শুধু তাই নয়। সাম্প্রদায়িকতা এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে স্বতন্ত্রভাবে না দেখলে তার স্বরূপকে ঠিক বোঝা যাবে না। ধর্মের আচার বিচার এবং তত্ত্বের প্রতি নিষ্ঠা থাকলে তাকে আমরা বলি ধর্মনিষ্ঠা। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা পৃথক জিনিস। কোন ব্যক্তির মনোভাবকে তখনই সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হয় যখন সে এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্তির ভিত্তিতে অন্য এক ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচরণ এবং ক্ষতিসাধন করতে প্রস্তুত থাকে। এ ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতিসাধন করার মানসিক প্রস্তুতি সেই ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় অথবা বিরুদ্ধতা থেকে সৃষ্ট নয়। ব্যক্তিবিশেষ এ ক্ষেত্রে গৌণ, মুখ্য হলো সম্প্রদায়। ধর্মনিষ্ঠার সাথে সম্পর্ক আছে ধর্মীয় তত্ত্ব এবং আচার বিচারের। সাম্প্রদায়িকতার যোগ হচ্ছে সম্প্রদায়ের সাথে। অর্থাৎ ধর্মনিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজের আচরণ এবং ধর্মবিশ্বাসের গুরুত্ব বেশি। সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে নিজের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ এক জাতীয় আনুগত্যের গুরুত্ব বেশী এ ছাড়া সত্যকার ধর্মনিষ্ঠা পরকালমুখী। পরকালেই তার সত্যকার পুরস্কারের আশা। সাম্প্রদায়িকতার মুনাফা ইহলোকে। ধর্মনিষ্ঠার জন্য অন্যের বিরুদ্ধাচরণের প্রয়োজন নেই। অন্যের বিরুদ্ধাচরণ এবং ক্ষতিসাধনের মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ এবং পরিণতি। ধর্মের সাথে তাই সাম্প্রদায়িকতার কোন প্রয়োজনীয় তত্ত্বগত সম্পর্ক নেই। ধর্মীয় তত্ত্ব এবং আচার-আচরণকে ভিত্তি করে যে সমাজ ও সম্প্রদায় গঠিত হয় সেই সম্প্রদায়ের ঐহিক স্বার্থই সাম্প্রদায়িকতার জনক। সাম্প্রদায়িকতার জন্য তাই ধর্মে নিষ্ঠাবান হওয়ার প্রয়োজন নেই। সাম্প্রদায়িকতা এ অর্থে পুরোপুরি ধর্ম নিরপেক্ষ।

২.

ধর্মনিষ্ঠা এবং সাম্প্রদায়িকতার এই প্রভেদ সত্ত্বেও অনেকের ধারণায় তারা অবিচ্ছেদ্য। এ ধারণাকে একটি সংস্কার হিসাবে গণ্য করা চলে। কিন্তু এ সমস্যার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এর থেকে একদিকে বিকৃত সামাজিক চিন্তা এবং অন্যদিকে সক্রিয় রাজনৈতিক দুরভিসন্ধির উৎপত্তি। মুসলমান অথবা হিন্দুর সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থকে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে সমর্থ হওয়ার অক্ষমতা আমাদের দেশের লোকের পক্ষে স্বাভাবিক মনে হয়। কারণ চিন্তার এ বিকৃতি আমাদের মধ্যে এসেছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে। এ বিকৃতি আমাদের মানসিকতাকে এমনভাবে গঠন করেছে যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশবাসীকে আমরা ধনী-দরিদ্র, শাসক-শোষিত, উৎপীড়ক-উৎপীড়িত মানবসন্তান হিসাবে না দেখে তাকে দেখতে শিখেছি, এক এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত জীবজন্তু হিসাবে। এ বিকৃতির ফলে তাই আমাদের সমাজে সুস্থ শ্রেণী চেতনা থেকে অসুস্থ্য সম্প্রদায় চেতনা অনেক বেশি প্রবল। এজন্যেই তাই আমাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবন ও চিন্তা এত পশ্চাদপদ এবং অনগ্রসর।

৩.

আমাদের দেশে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় এবং সামাজিক চিন্তার ব্যবধান অনেক। এই ব্যবধানের ফলে এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক পর্যায়ে যে পরিমাণ লেনদেন হওয়ার কথা কোন দিনই তা হয়নি। সমাজিক লেনদেনে এবং বিবেচনায় ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্রপ্রীতি এবং মিলন সংস্থাপনের অন্যতম পথ। সে পথ বিভিন্ন কারণে সন্তোষজনকভাবে উন্মুক্ত না থাকাই অন্যতম কারণ যার জন্য ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান শত শত বছর পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়নি। হিন্দু-মুসলমানের এ ব্যবধান জনসাধারণের ক্ষেত্রে গোড়াতেই সক্রিয় বিরোধের পরিণত না হলেও ইংরেজদের আবির্ভাবের পূর্বেই পার্থক্যের একটা অস্বাস্থ্যকর চেতনা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বর্তমান ছিল। এই ভেদজ্ঞানকে তাই পুরোপুরি ইংরেজদের সৃষ্ট বলা চলে না। ইংরেজরা অবশ্য এই চেতনাকে সুযোগ মত তীব্রতর করে উভয় পক্ষেরই মনুষ্যত্বকে বহুলাংশে খর্ব করেছে। শুধু তাই নয়, হিন্দু মুসলমানের ধর্মীয় এবং সামাজিক ব্যবধানকে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী প্রয়োজনে সক্রিয় প্রচেষ্টায় তারা পরিণত করেছে রাজনৈতিক বিরোধে। এই পরিণতির নামই সাম্প্রদায়িকতা।

৪.

বৃহত্তর ভারতীয় জীবনক্ষেত্রে ইংরেজদের আগমন যে গতি এবং চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল তার ফলে অনেক পুরাতন সমস্যা নিশ্চিহ্ন হল এবং উদ্ভব হল অনেক সমস্যার। ইংরেজদের আগে ভারতবর্ষ বহুবার পরাভূত হয়েছে বৈদেশিক শক্তির কাছে। ধর্ম, জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে তারা এসেছে। তাদের এ আগমনে সমাজের উপরতলায় রাজরাজেশ্বরেরা, পেয়েছে আঘাত কিন্তু ভারতবর্ষের বৃহত্তর জীবনকে তারা স্পর্শ করেনি। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় জীবন যে খাতে প্রবাহিত হয়েছে ইংরেজদের পূর্বে অন্য কোন বিদেশীর আবির্ভাব তার মধ্যে কোন পরিবর্তন আনেনি।

ইংরেজ-পূর্ব যুগে ভারতে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমূহেই ছিল তার সমাজ ও আর্থিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র। এ গ্রামগুলি ছিল দ্বীপসদৃশ এবং সারা ভারতবর্ষ ছিল বিশাল এক দ্বীপপুঞ্জ। অন্ন-বস্ত্র এবং জীবনের যাবতীয় আয়োজনের দিক থেকে গ্রাম বহির্ভূত কোন কিছুর প্রতি তাদের বিশেষ কোন নির্ভরতা ছিল না। প্রয়োজন তাদের ছিল অতি পরিমিত এবং ব্যাপক বিনিময় ব্যবস্থার পরিবর্তে যৌথ গ্রাম্য প্রচেষ্টায় তারা সে প্রয়োজন পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম ছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় অল্পবিস্তর পার্থক্য থাকলেও এই ছিল তখন সারা দেশের বৃহত্তর অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা। শুধু তাই নয়, অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তিতে তাদের যে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন তারও মধ্যে ছিল সেই সনাতন স্বয়ং-সম্পূর্ণতা। ভারতের সাধারণ গ্রাম্য-জীবনযাত্রার মধ্যে বিপুল সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও গ্রামসমূহের মধ্যে কোন বিশেষ পারস্পরিক প্রয়োজনগত যোগাযোগ ছিল না। এই আত্মনির্ভরশীলতাই ভারতীয় জীবনযাত্রার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যের

মাহাত্ম্যেই রাজ্যসাম্রাজ্যের উত্থান পতনকে অগ্রাহ্য করে প্রাচীন জীবনব্যবস্থা ভারতবর্ষে নিজেকে রেখেছিল অব্যাহত।

ইংরেজদের আগমনে সে জীবনযাত্রা ব্যাহত হল। একদিনে নয় ধীরে ধীরে এ পরিবর্তন এল প্রায় দুই শতাব্দী ধরে। এ দুই শতাব্দীর ইংরেজ রাজত্বের পর ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি প্রায় আমূলভাবে পরিবর্তিত হল। সংখ্যাতীত বিচ্ছিন্ন গ্রামসমূহ নিয়ে গঠিত যে ভারতবর্ষ সেই উপমহাদেশ বিকশিত হল জাতীয় চেতনা গঠিত হল জাতীয় আন্দোলন। এ পরিবর্তন ভারতবর্ষের পক্ষে নিঃসন্দেহে কল্যাণকর। কিন্তু তবু জাতীয়তার উত্থান এদেশে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে আমাদের জাতীয় জীবনে সৃষ্টি হল কিছু জটিলতা। এ জটিলতার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাই সর্বপ্রধান। সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে তাই তার যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হলে ভারতবর্ষে জাতীয়তার উত্থান ও বিকাশের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা প্রয়োজন।

৫.

ইংরেজদের পূর্বে অন্যান্য দেশীয় এবং বৈদেশিক রাজচক্রবর্তীদের সাথে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের সম্পর্ক ছিল রাজস্ব-লেনদেনে। রাজা এবং রাজবংশের পতন-উত্থানের অর্থ তাদের কাছে তাই ছিল রাজস্ব-গ্রহীতার পরিবর্তন মাত্র। কিন্তু ইংরেজদের আগমনে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক শুধু রাজস্ব-লেনদেনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল না। তারা ভারতবর্ষে শুধু নতুন সাম্রাজ্যের পত্তন করে নতুন রাজবংশ আমদানী করেই ক্ষান্ত হল না—তারা সাথে নিয়ে এল নতুন জীবন ব্যবস্থা, জনসাধারণের জীবনে স্থাপন করল আর্থিক যোগাযোগ। নিজেদের পণ্যদ্রব্য ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়ে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জকে তারা পরিণত করল ভারতীয় মহাদেশে। অশোক-আকবরের সুদূর বিস্তৃত সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে যে ঐক্য এবং অখণ্ডতা এনেছিল সে ঐক্য ছিল বাহ্যিক শাসনের। ইংরেজ তার পণ্যদ্রব্যের মাধ্যমে এদেশে যে ঐক্যের সূচনা করল সে ঐক্য শাসনের যেটুকু তার থেকে অনেক বেশী জীবনযাত্রার।

ইংরেজ-পূর্ব যুগে ভারতবর্ষে শ্রমবিভাগ ছিল জন্ম-নির্ভর ইংরেজরা এদেশে ধনতন্ত্রের বীজ বপন করে শ্রমবিভাগকে করল জন্ম নিরপেক্ষ। ভারতবর্ষের আর্থিক এবং সামাজিক জীবনে আজ পর্যন্ত এই হল সব থেকে বড় বিপ্লব। এই বিপ্লবই এদেশে বিচ্ছিন্ন জীবনপ্রবাহকে ধীরে ধীরে করল নিরবিচ্ছিন্ন। সামাজিক অচলাবস্থার অবসানে শুরু হল চলাচলের বিপুল ব্যবস্থা।

৬.

ইংরেজরা ভারতবর্ষে জীবনযাত্রার যে নতুন আয়োজন করল তাতে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলে কিন্তু সমানভাবে এগিয়ে এল না। নতুন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আগের তুলনায় খর্বই হল অনেকখানি। ইংরেজরাও তাদের পূর্ববর্তী হিসাবে পুরাতন হিন্দু এবং বিশেষ করে মুসলমান আমীর ওমরাহ এবং রাজন্যবর্গকে সুনজরে দেখল না। উপরতলার মুসলমান সমাজে তাই দেখা দিল ক্ষয়িষ্ণুতার লক্ষণ। সে ক্ষয়িষ্ণুতা

তাদের অনেকখানি নিজেদের দোষে হল আরও তরান্বিত এবং দীর্ঘস্থায়ী। সেই সাথে মুসলমানদের বিরাট এক অংশ মোঘল এবং মুসলমান সাম্রাজ্যের পতনকে তাদের নিজেদের পতন বলে গণ্য করে নিজেদেরকে করল একঘরে।

অন্যদিকে ভারতের অমুসলমান জনসাধারণ জীবনের যোগাযোগ এবং চলাচলের নতুন আয়োজনে যোগ দিল বিপুল উৎসাহে। মোগল সাম্রাজ্যের পতনকে নিজেদের পতন বলে ভুল করার কারণ তাদের ছিল না। উপরন্তু সে পতনের মধ্যেই তারা দেখল নিজেদের উত্থানের সুস্পষ্ট নির্দেশ। এ নির্দেশ শিরোধার্য করে তারা অবতীর্ণ হল নতুন জীবন সংগ্রামে। ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরি, শিক্ষা-দীক্ষা এবং জীবনের বিভিন্ন ও বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে তারা নিজেদেরকে এক শতাব্দী ধরে করল সুপ্রতিষ্ঠিত।

৭.

এর পর এল সিপাহী বিদ্রোহ। বিদ্রোহের অবসানে মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে এল এগিয়ে চলার তাগিদ। এই সর্বপ্রথম তাদের মধ্যে অনুভূত হল ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার প্রয়োজন। ইংরেজরাও এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকল না। দুই পক্ষই প্রস্তুত হল সহযোগিতার আয়োজনে। এদিকে হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ নিজেকে ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি ও শিক্ষাদীক্ষায় অনেকখানি প্রতিষ্ঠিত করার পর তার মধ্যে সহযোগিতার উৎসাহ সিপাহী বিদ্রোহের পর অনেকখানি কমে এল। মুসলমানদের পিছিয়ে রেখে তারা অনেকখানি এগিয়ে এল ইতিমধ্যে। ইংরেজদের সাথে পুরোপুরি সহযোগিতার পালা শেষ করে শুরু হল এবার তাদের রেষারেষির পালা—এ রেষারেষির থেকেই জন্ম নিল জাতীয় চেতনা। এই রেষারেষিই গঠন করল জাতীয় আন্দোলন, যে আন্দোলনের শুরু ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে।

৮.

হিন্দুদের এই অগ্রসর পদক্ষেপ এবং মুসলমানদের পশ্চাদমুখীনতাই রচনা করল সাম্প্রদায়িকতার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ। জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোন সময়েই সারা দেশ সমানভাবে অগ্রবর্তী হয় না। আয় এবং সম্পদও সকলের সমান থাকে না। প্রত্যেক দেশেই একশ্রেণী অগ্রসর এবং অন্যশ্রেণী পশ্চাদপদ থাকে। জাতীয়তার ক্ষেত্রে জনসাধারণের এই অসমান উন্নতি কোন বাধা সৃষ্টি করে না। সেদিক থেকে ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনে কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। কিন্তু তবু বৈশিষ্ট্যও তার মধ্যে ছিল। কারণ সাধারণভাবে দেশের মধ্যে যারা অগ্রসর তারা হল হিন্দু এবং মুসলমানরা হল সাধারণভাবে পশ্চাদপদ। ভারতবর্ষে শ্রেণীবিভাগের বৃহত্তর কাটামোর মধ্যে এইভাবে দেখা দিল সম্প্রদায় বিভাগ। অন্যান্য দেশের মত তাই ভারতেও জাতীয় আন্দোলন মোটামুটি মধ্যবিত্ত কেন্দ্রিক হলেও সে মধ্যবিত্ত দ্বিধা বিভক্ত হল দুই সম্প্রদায়ে।

আধুনিক হিন্দু মধ্যবিত্তের উত্থানের মুহূর্তে অন্য কারো সাথে তার কোন রেষারেষি ছিল না। ইংরেজ ছিল তার বহু ঊর্ধ্বে। মুসলমান তার থেকে ছিল অনেক পশ্চাতে। প্রায় এক শতাব্দী ধরে তাদের প্রগতি তাই থাকল অব্যাহত। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে ঠিক

তেমনি ঘটল না। ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে মুসলমান মধ্যবিত্তের উত্থান পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকল হিন্দু মধ্যবিত্তের দ্বারা। শুরু হল তাদের প্রতিযোগিতার পালা। এর পর থেকে হিন্দু এবং মুসলমানের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন এই প্রতিযোগিতার দ্বারাই মোটামুটিভাবে নিয়ন্ত্রিত হল। ইংরেজদের কাছে হিন্দুসমাজ ছিল সহযোগিতা প্রার্থী। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর হিন্দু সমাজের একাংশ হল ইংরেজ বিরোধী। মুসলমান সমাজ এক শতাব্দী ধরে নিজেকে রেখেছিল বিচ্ছিন্ন করে, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর তারাই আবার এগিয়ে এল ইংরেজদের সাথে সহযোগিতা করতে। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের সূচনায় হিন্দু-মুসলমানের এই স্বার্থগত সংঘর্ষকে ইংরেজরা উপেক্ষা করল না। উপরন্তু নিজেদের সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে এই বিভেদকে স্বীকৃতি দিয়ে অনেক কৌশলে এককে অন্যের বিরুদ্ধে তারা স্থাপন করল। এ ভেদনীতির মুনাফা নিয়ে ইংরেজের হিসাবে কোন ভুল ছিল না। ভারতীয় সমাজ-জীবনে সিপাহী বিদ্রোহের পর যে সম্প্রদায়-চেতনা দেখা দিল সে চেতনা জাতীয় চেতনার মধ্যে সৃষ্টি করল অনেক বিভ্রান্তি। সুযোগ-সুবিধা হিসাব-নিকাশের রণক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে অবতীর্ণ হল দুই ভারতবর্ষ।

৯.

পশ্চাদপদ মুসলিম সম্প্রদায় হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য এবং চাকরির ক্ষেত্রে সরাসরি প্রতিযোগিতায় দ্রুত উন্নতির ভরসা পেল না। ইংরেজদের কাছে তারা দাবি করল বিশেষ সুবিধা। ১৯০৬ সালে আগাখাঁর নেতৃত্বে লর্ড মিণ্টোর কাছে তারা পেশ করল তাদের এই প্রার্থনা। গভর্নর জেনারেল তাদেরকে নিরাশ করলেন না। এমনকি নতুন শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনে মুসলমান হিন্দুর পৃথক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা পর্যন্ত মঞ্জুর করার ভরসা তিনি দিলেন। এ ভরসা শুধু মৌখিক ছিল না। ১৯০৯ সালের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনে ভারতে প্রচলিত হল সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন। এর পর থেকে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান মিলিত সংগ্রামের আর তেমন সুযোগ পেল না। লক্ষ্ণৌ চুক্তি এবং খেলাফৎ আন্দোলনের সমঝোতা হল নিতান্তই সংক্ষিপ্ত।

পৃথক নির্বাচনই ইংরেজদের ভেদবুদ্ধির সব থেকে নিদারুণ অস্ত্র। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য মিলিত রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অনেকখানি নিশ্চিহ্ন হওয়ার যে সম্ভাবনা ছিল পৃথক নির্বাচন তাকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করল। ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলন পরিচালিত হল সংকীর্ণ শাসনতান্ত্রিক পথে এবং পৃথক নির্বাচনের মহিমায় হিন্দু-মুসলমানের এক পথ ধরে চলার পথ হল বন্ধ।

শাসনতান্ত্রিক পথে বুর্জোয়া নেতৃত্বে পরিচালিত না হয়ে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন যদি বৃহত্তর বিপ্লবের পথে চালিত হত তাহলে পৃথক নির্বাচন দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে এতখানি বিষাক্ত করতে সমর্থ হত না। কিন্তু কংগ্রেস অথবা মুসলিম লীগের নেতারা সকলেই মোটামুটি মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি। শাসনতন্ত্রের সরল পথ ত্যাগ

করে অন্য পথ ধরার কোন সামর্থ্য তাঁদের ছিল না। কাজেই ভারতীয় আন্দোলন ভারতবর্ষে জোরদার হল শাসনতান্ত্রিক পথে এবং সেই সাথে মধ্যবিত্ত হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ব্যস্ত হল পরস্পরকে খর্ব করতে।

১০.

কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংগঠন হিসাবে গঠিত হলেও শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের নেতৃত্ব গেল মুসলিম লীগের হাতে। শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের মধ্যে যে সমস্ত খ্যাতিমান মুসলমান নেতৃত্বস্থানে ছিলেন তাঁদের অধিকাংশ একে একে এলেন মুসলিম লীগে। নেতৃত্ব দিলেন এই প্রতিষ্ঠানকে। এদিকে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী অসাম্প্রদায়িক নেতৃত্বের মধ্যে ফাটল ধরল। কিছু সংখ্যক কংগ্রেস সদস্য সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে থাকলেও কংগ্রেসে পূর্বতন চরিত্র অনেকখানি পরিবর্তিত হল। তার মধ্যেও উনিশশো তিরিশের দিকে সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা বিশেষভাবে হল চিহ্নিত।

পৃথক নির্বাচনের ফলে নির্বাচনে হার জিতের ক্ষেত্রে সংগঠন নিরপেক্ষভাবে হিন্দু হিন্দুর উপর এবং মুসলমান মুসলমানদের উপর হল নির্ভরশীল। এর ফলে শুধু নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় নয়, নির্বাচনোত্তর রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা রইল অহরহ জাগ্রত। ভারতের বৃহত্তর অর্থনৈতিক জীবনে শ্রেণী সংঘাতের সত্যকার রূপ এইভাবে আচ্ছন্ন হল সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা।

১১.

পৃথক নির্বাচন প্রথা চালু হবার পর হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় স্ব স্ব নির্বাচক মণ্ডলীর উপরই হল ক্ষমতার রাজনীতিতে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এর ফলে মধ্যবিত্ত হিন্দু মুসলমানের সুবিধাবাদিত্বের পথ হল আরও পরিস্কৃত। তারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে উপেক্ষা করে অন্য সম্প্রদায়ের সমালোচনা ও বিরোধিতাকেই মনে করল অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য। এই নেতিবাচক মনোভাবকে সাধারণের মধ্যে প্রবলতর করে ভারতের হিন্দু-মুসলমান মধ্যবিত্ত স্থগিত রাখল বৃহত্তর গণবিপ্লব।

শুধু তাই নয়। এর ফলে ভারতীয় আন্দোলনের চরিত্রও পরিবর্তিত হল। জাতীয় আন্দোলন হিসাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামোর মধ্যে তার একটা প্রগতিশীল ভূমিকা থাকলেও সাম্প্রদায়িক প্রভাবে সে-আন্দোলন ভাষাভিত্তিক জাতীয় আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ না করে একটা প্রতিক্রিয়াশীল আকার ধারণ করল। সাম্প্রদায়িক নির্বাচক মণ্ডলীকে কোন সুস্থ চিন্তার অবকাশ না দেওয়ার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের বিরোধ এবং পার্থক্যের উপরই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব পড়ল বেশী। এই বিরোধ পার্থক্যকে বিলোপের চেষ্টা না করে তারা অনেক ক্ষেত্রে শান্তিপ্রিয় মানুষকে ইচ্ছাকৃতভাবে চালনা করল দাঙ্গার পথে। এর পর উপমহাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামে দাঙ্গাই হয়ে দাঁড়াল উভয় পক্ষের এক নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার। হিন্দু-মুসলমান এবং বিশেষ করে ইংরেজ-এ হাতিয়ারকে করল ইচ্ছেমত ব্যবহার। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং খুন জখমের মাধ্যমে পারস্পরিক

বিরোধ ক্রমশ তীব্রতর হল এবং উনিশশো চল্লিশের দিকে মিলিত জাতীয় আন্দোলনের কোন পথ আর খোলা রইল না। ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ এমনকি কংগ্রেস লীগের নেতারাও মাত্র কয়েক বৎসর আগে যে পরিণতির কথা চিন্তা করেননি তাই ঘটল। লাহোর প্রস্তাব পাস হল ১৯৪০ সালে এবং তার মাত্র সাত বৎসর পরই ভারতবর্ষ হল দ্বিধাবিভক্ত।

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে সাম্প্রদায়িক সমস্যার একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান হিসাবে ভারতবর্ষে স্থাপিত হল দুই রাজ্য। কিন্তু যে তিক্ততা এবং বিরোধের মধ্যে এ সিদ্ধান্ত কার্যকরী হল তাতে মূল সমস্যার কোন সমাধান হল না। উপরন্তু সাম্প্রদায়িকতা নবজীবন লাভ করল।

১২.

ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যায় যে মুসলমানরা ভারতে পদার্পণ করার ঠিক পরবর্তী যুগে সাধারণ হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় বিষয় ছাড়া অন্যান্য যে তফাৎ ছিল সেটা নিতান্তই সামাজিক। মুসলমানরা কয়েক শতাব্দীকাল এদেশে হিন্দুদের সাথে বসবাস করলেও সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য সামাজিক গণ্ডীর মধ্যেই প্রায় সীমাবদ্ধ ছিল। এর প্রধান কারণ ইংরেজরা আসার পূর্বে ভারতবর্ষের সমাজ জীবনে এমন কোন মৌলিক পরিবর্তন আসেনি, যে পরিবর্তন জনগণের জীবনে রেষারেষি এবং প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করতে সক্ষম। সে পরিবর্তন এল ইংরেজের সাথে। তারা এদেশে বপন করল ধনতন্ত্রের বীজ। ভারতবর্ষের সমাজ ও আর্থিক জীবনে ধীরে ধীরে এল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে শুরু হল প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতা বিভিন্ন কারণে হিন্দু-মুসলমানের আর্থিক জীবনের মধ্যে নিয়ে এল বিরোধ, সংঘর্ষ এবং রেষারেষি। আর্থিক জীবনের এ বিরোধ বিস্তৃত এবং অধিকতর পরিণত হয়ে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই রূপান্তরিত হল ঘোরতর রাজনৈতিক বিরোধে। এ রাজনৈতিক বিরোধ ক্রমশ তীব্রতর হয়ে দেশকে করল বিভক্ত এবং সাম্প্রদায়িকতাকে নিশ্চিহ্ন না করে তাকে উভয় দেশের জাতীয় জীবনে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত রাখল অনির্বাণ।

১৩.

সাম্প্রদায়িকতাকে উপমহাদেশের জীবনে নিশ্চিহ্ন করতে হলে যে মূল কারণে তার উৎপত্তি, বিকাশ এবং বিস্তৃতি সেই কারণসমূহের প্রতিটি দৃষ্টি দেওয়ার দরকার। এজন্যে তাই প্রয়োজন আমাদের শুধু আমাদের নয় সারা পাকভারত উপমহাদেশের বৃহত্তর সমাজ-জীবনকে নতুন অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। যে পর্যন্ত না দেশের উন্নতি কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্তে বৃহত্তর স্বার্থরক্ষার পথে চালিত হবে সে পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সমস্যার আর্থিক এবং সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি অটল থাকবে। সাম্প্রদায়িকতার অগ্নিশিখাকে নির্বাপিত করার জন্য তাই প্রয়োজন দেশের আর্থিক বৈপ্লবিক রূপান্তর।